আনন্দবাজার পত্রিকা

গাঁধী যাকে ধর্ম মানতেন

# মুসলমানের ঈশ্বর কি হিন্দুর ঈশ্বরের চেয়ে আলাদা

শান্তভানু সেন

১০ অক্টোবর, ২০১৯

এক সময়কার জনপ্রিয় বই ‘শীতে উপেক্ষিতা’-য় রঞ্জন এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। গাঁধীজি যে দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন সে দিন রঞ্জন ছিলেন দার্জিলিং-এর এক হোটেলে। শীতার্ত সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় হোটেলের ভুটিয়া বেয়ারা লেখককে জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, গান্ধী লামা কি হিন্দু ছিলেন, না বৌদ্ধ?...উনি বুদ্ধ।...বৌদ্ধ ছাড়া এমন হবেন কী করে?... না, উনি নিশ্চয়ই খ্রিস্টান, উনিই খ্রিস্ট, তা নইলে এমন হবেন কী করে?... না, উনি নিশ্চয় মুসলমান, উনিই পয়গম্বর, তা নইলে এমন হবেন কী করে?’ রঞ্জন লিখছেন, ‘আমাকে নিরুত্তর দেখে বেয়ারা আবার বলল,

উনি নিশ্চ য়ই বৌদ্ধ ছিলেন।' সে কী করে জানল নিরক্ষর ভুটিয়া বেয়ারা সে-কথা বলতে পারে না। কিন্তু, সে জানে, 'গাঁধীজী ওর আত্মীয় ছিলেন, স্বধর্মী ছিলেন, আপনজন ছিলেন।'

শুধু সেই বেয়ারা নয়, অগণন দেশবাসীর চোখে গাঁধী ঈশ্বর। নিরক্ষর, ক্ষুদ্র ভূগোলের মধ্যে সংক্ষিপ্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া গ্রামবাসী, নগরের উজ্জ্বলতার নীচে জেগে থাকা বিনিদ্র বস্তির লোক, সকলের মধ্যেই গাঁধী সম্পর্কে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তাকে কি চেতনা বলব না? কোথা থেকে এল এই চেতনা? দেশ-জাতি-ধর্ম সম্পর্কে গাঁধীর যে মুক্ত চেতনা, যেখানে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রাষ্ট্রের কোনও অধিকার নেই তা নিয়ে ছেলেমানুষি করার, তা-ই ফিরে ফিরে আসে লোকমানসে— লোকবিশ্বাস হয়ে।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসে তিনি 'কট্টর' হিন্দু, কিন্তু সে বিশ্বাসে অ-হিন্দু তাঁর বৈরি নয়, আত্মীয়। এক বার এক উকিল বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে গাঁধী হিন্দুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি এর সংজ্ঞা ঠিক বলতে পারবেন না, তবে এর অর্থ, সব ধর্মকেই সমান চোখে দেখা। তাঁর প্রতিপ্রশ্ন, মুসলমানের ঈশ্বর কি হিন্দুর ঈশ্বরের থেকে আলাদা? তাঁর মূল্যায়নে, 'ইসলাম বা অন্য মহতী ধর্মচিন্তাকে আমি নিজের ধর্মের মতই সত্য বলে মনে করি। ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম যে সংস্কৃতি বয়ে এনেছে, তা ভারতকে সমৃদ্ধই করেছে।'

যে পরিবেশে তাঁর জন্ম ও বড় হওয়া, সেখান থেকেই গড়ে উঠেছিল এই বিশ্বাস। মা ছিলেন পুনামি সম্প্রদায়ভুক্ত, যা হিন্দু ধর্মানুসারী হলেও নানা ধরনের ইসলামি বৈশিষ্ট্য ধারণ করত। শৈশবে তাঁর ওপর জৈন ধর্মেরও প্রভাব পড়েছিল। তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, মক্কেল, বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। ছোটবেলায় রাজকোটের বিদ্যালয়ে অন্যান্য সহপাঠীদের দৈহিক নিপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করত একটি বড়সড় চেহারার মুসলমান কিশোর— শেখ মেহতাব, যাঁকে পরে গাঁধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাঁদের খামারবাড়িতে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইহুদি ও খ্রিস্টান। ধর্মীয় সংযোগ যে মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করতে

পারে না, এবং ভিন্নধর্মবিশ্বাসী হয়েও অন্যের পাশে দাঁড়ানোটা কর্তব্য হয়ে ওঠে, গাঁধীজির জীবন জুড়ে এই বিশ্বাসের অনুশীলন। এরই ফসল, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সমেত প্রায় ৪০টি আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব দান, যার মধ্যে ছিল খিলাফত। ব্রিটিশরা মক্কা-মদিনার অভিভাবকত্ব থেকে খলিফাকে সরাতে গেলে তার বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত আন্দোলনের সভাপতি হন মহাত্মা।

তিনি বহু বার বলেছেন যে, রামরাজ্য বলতে তিনি হিন্দু রাজত্ব বোঝেন না, বোঝেন ঈশ্বরের রাজত্ব। নিষ্ঠুর অসাম্যের সমাজে যেখানে কিছু লোক সম্পদের কোলে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর জনগণের পেটে জুটছে না ন্যূনতম আহার, সেখানে রামরাজ্য আসতে পারে না। রাজঘাটের প্রার্থনাসভায় তাঁর বক্তব্য, বিধর্মীদের অত্যাচারে হিন্দুরা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু বিধর্মীরা যা করেছে হিন্দুরাও যদি তা করে তাহলে ধর্ম রক্ষিত হবে কী করে?

ক্ষমা থেকে ঈশ্বরে পৌঁছনোর এক অনন্য পথ ছিল গাঁধীর ধর্মদর্শন। এক বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সন্তানহারা এক হিন্দু পিতা গাঁধীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর সন্তান হত্যার প্রতিশোধ কী ভাবে নেওয়া যায়? তিনি উত্তর পান, দাঙ্গায় নিহত কোনও মুসলমানের অনাথ সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিন। নির্মল বসু তাঁর মাই ডেজ় উইথ গাঁধী-তে লিখছেন, নোয়াখালির দাঙ্গার পর এক মৌলবি বলেছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা তাদের জীবন বাঁচাতে পেরেছে। গাঁধীর প্রত্যুত্তর, “আপনার কথা শুনে আমি হতবাক। ভগবান কী করে আপনাকে ইসলাম ধর্মের পণ্ডিত তৈরি করেছেন?”

শুধু ধর্ম নিয়ে নয়, যে কোনও ধরনের বিভাজন যে বিদ্বেষ তৈরি করে, সে বিষয়ে গাঁধী ছিলেন ঘোর অসহিষ্ণু। যেমন জাতপাত। বিপান চন্দ্রের লেখায় পাচ্ছি, ১৯২০র দশকের প্রথম দিকে গাঁধী বিভিন্ন ধর্ম বা জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর আশ্রমেই এই ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠানে

তাঁকে মুখ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়। মুসলমানকে বিয়ে করার কারণে অরুণা আসফ আলির এক কাকা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। অরুণার স্মৃতিচারণে জানা যায়, ১৯২৮ সালে তাঁদের বিয়েতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও মুখ ফিরিয়ে নেন, পাশে এসে দাঁড়ান মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধী। ফিরোজ-ইন্দিরার বিয়েতে গোড়ায় এমনকি নেহরুরও সম্মতি ছিল না, হিন্দু শাস্ত্র অনুসরণ করে গাঁধী ফিরোজকে দত্তক নিলেন, এর পর আর বিয়েতে কোনও বাধা রইল না। আবার, ১৯৪৬-এ তাঁর ঘোষণা, সবরমতী আশ্রমে এমন কোনও বিয়ে হবে না যেখানে বর বা কনের এক জন হরিজন নয়।

দক্ষিণ ভারত থেকে গাঁধীজি এক হরিজন দম্পতি ও তাঁদের কন্যা লক্ষ্মীকে আমদাবাদের আশ্রমে নিয়ে আসেন, কস্তুরবার বিরোধিতা সত্ত্বেও। তাঁদের আশ্রমের কুয়োর জল খেতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। গাঁধী এখানেও সত্যাগ্রহী— ওঁরা ওখানকার জল না পেলে তিনিও সেই জল ব্যবহার করবেন না। আশ্রমে যাঁরা আর্থিক সাহায্য দিতেন, তাঁরা সাহায্য বন্ধ করলেন। গাঁধী অবিচল। জাত-পাতের বিরুদ্ধে তাঁর ‘গোঁড়ামি’-র নিদর্শন জীবন জুড়ে। ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে দেখেন, পৃথক জাতের ছেলেদের খাওয়ার পঙ্‌ক্তি আলাদা। তাঁর আপত্তিতে গুরুদেবকে, কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই, এই ব্যবস্থা তুলে দিতে হয়। জাতপাতের বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় ১৯৩৪ সালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাছে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়। একই বছরে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁর গাড়িতে বোমাও ফেলা হয়েছিল।

বিশ্বাসে হিন্দু, কিন্তু বাহ্যিক উপচারে তাঁর আস্থা নেই। ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি চার বার মাদুরাই গেলেও মীনাক্ষী মন্দিরে প্রবেশ করেননি। দলিত সম্প্রদায় যত দিন না মন্দিরে প্রবেশ করেছে, তত দিন তিনি মন্দিরের সীমানা বর্জন করেছেন। তাঁকে না জানিয়ে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের জগন্নাথ দর্শন তাঁকে ব্যথিত করে।

কংগ্রেসের মধ্যে গাঁধী ছিলেন ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান, অথচ, ধর্মনিরপেক্ষতায় দু-জনেরই অনড় বিশ্বাস। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। নেহরুর আত্মকথায় পাই, গাঁধীজি হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে গর্বিত, কিন্তু তাঁর কামনা হিন্দু ধর্মের এক বিশ্বজনীন রূপ। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে ১৯৪৭ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজের রেভারেন্ড জন কেলার্স-এর প্রশ্নের উত্তরে গাঁধীজি বলেছিলেন, রাষ্ট্র কোনও ধর্ম বা জাতির নয়, যে কোনও ব্যক্তির তার নিজস্ব ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকা উচিত। রাষ্ট্র সেখানে নাক গলাতে পারে না।

এত কাল তিনি যে নেই, সেটা আমরা অনুভব করতে পারছিলাম না। ভারত তাঁর বহু কিছু গ্রহণ না করেও ধর্ম বিষয়ে মুক্তচিন্তার অনেকখানি আঁকড়ে রেখেছিল। আজ ভারতরাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি সেটুকুও ভুলিয়ে দিতে চায়। ‘গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার’-এর মতান্ধ নিষ্ঠুরতা যখন দেশবাসীকে অন্ধত্বের কিনারায় পৌঁছে দিচ্ছে, ধর্মকে করে তোলা হচ্ছে নরহত্যার দর্শন, তখন ভুটিয়া বেয়ারার চোখে ধরা পড়া গাঁধীর সেই উন্মুক্ত ঐশ্বরিক স্বরূপই আমাদের অবলম্বন।

গাঁধীর আমাদের মধ্যে  না থাকাটা ক্রমশ তাঁর আমাদের জন্য থাকাটাকে বিপুল করে তুলছে।

*প্রতীচী ইনস্টিটিউট, শান্তিনিকেতন*